বেগম রোকেয়ার চিন্তা ও কর্ম : কতিপয় অনালোচিত দিক

শারমিন ইসলাম*

আঁধার রজনী, নিদ্রিত পুরী, নাহি জন কোলাহল ;
মরণ-তন্দ্রা বিছায়েছে তা'র শিথিল নীলাঞ্চল।
দুর্যোগ-রাতি, নিভিয়া গিয়াছে শিয়রের দীপশিখা ;
ঘরে ঘরে আজি জাগিতেছে শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা।
এ গভীর রাতে কে তুমি জননী, কল্যাণ-দীপ জ্বেলে,
এই বাংলার নিদ-মহলার তিমির দুয়ারে এলে? ...

শা'জাহান চেয়ে বড় তুমি প্রেমে, পূণ্যে ও গরিমায়,
হার মেনে যায় তাঁহার 'তাজ' যে এ তাজের তুলনায়!
সে তো সম্রাট, সীমা নাহি তার বিত্ত সামগ্রীর,
তুমি যে রিক্তা, বুকের রক্তে গড়েছো এ মন্দির!
বাংলার যদি কোথাও মোদের তীর্থ ক্ষেত্র থাকে,
সে হবে তোমার এই মন্দির রেখে গেলে তুমি যাকে।[১]

কবি গোলাম মোস্তফা যাঁকে উদ্দেশ্য করে কবিতার এ চরণগুলো লিখেছেন তিনি হলেন বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। মানুষের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, আচার আচরণ ইত্যাদি সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার নির্মাতা নাকি পারিপার্শ্বিক সমাজ কাঠামোই মানুষের চালিকাশক্তি - এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা সে বিতর্কে যাব না। এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা তাঁদের সময়ের

---

* প্রভাষক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

১. 'দু:সাহসিকা', *মাসিক মোহাম্মদী*, মাঘ, ১৩৩৯

তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর এবং পুরাতন ঘূণে ধরা সমাজের যা কিছু অসংগতি আছে তা তাঁদেরকে নাড়া দেয় প্রবলভাবে। মানুষের ক্লান্ত, অবদমিত আত্মচেতনাকে আলোকস্পর্শে জাগিয়ে তোলাই যেন এঁদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। বেগম রোকেয়া তাঁদেরই একজন।

প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর কিংবদন্তি মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার পরিচয় আমাদের সামনে দু'ভাবে প্রতিভাত হয়। এক শ্রেণীর লেখকের রচনায় রোকেয়ার যে ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে তাতে মনে হয় তিনি অত্যন্ত typical অর্থে নারীবাদী, পুরুষবিদ্বেষী, পাশ্চাত্যবাদী ও ইসলাম বিদ্বেষী, অপর এক শ্রেণীর লেখক যারা কুরআন-হাদিসের যথার্থ জ্ঞান বিবর্জিত কিন্তু নিজেদের ইসলামপন্থী বলে দাবি করেন, তাঁর লেখার বিরোধিতা করেছেন। আসলে দুটো দৃষ্টিভঙ্গিই একপেশে, বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো রোকেয়াকে সমকালের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে পক্ষপাতহীনভাবে তাঁর সঠিক চিন্তা-চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। প্রকৃতপক্ষে রোকেয়া ছিলেন নারী-পুরুষের সম্পর্কের পুনর্গঠনকারী একজন মহান প্রতিভা। তিনি ছিলেন একাধারে সুসাহিত্যিক, শিক্ষানুরাগী, নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ ও সর্বোপরি একজন সমাজ সংস্কারক। তবে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রধানত তাঁর শিক্ষাভাবনা এবং সমাজসংস্কার সম্পর্কিত কিছু অনালোচিত দিকের প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের মূলে যে বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা রাখে তা এদেশের নারীদের অবস্থা। সকল সংস্কার প্রচেষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নারীদের শৃঙ্খলমোচন ও নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, এসব সংস্কার ছিল মূলত নারী শিক্ষা বিস্তারে, সতীদাহ প্রথা নিরসনে, বিধবাবিবাহ প্রচলনে, পুরুষের বহুবিবাহ রোধে প্রভৃতি।

কোন কোন লেখক মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬) বা শিখাগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের মুসলিম মানসের নবজাগরণের দূত বলে নির্দেশ করতে চান। কিন্তু বেগম রোকেয়ার আবির্ভাব এদের দুই দশক আগে। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছেন রোকেয়া। ১৯০৪ সালে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের বঞ্চনা ও নিপীড়ন বিষয়ে সুদৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছেন, নতুন চিন্তা, কৌতূহল,

অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিপ্রিয়তা প্রভৃতির মাধ্যমে মানব কল্যাণ সাধনের বাণী প্রচার করেছেন তিনি।[২]

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে বেগম রোকেয়ার জন্ম। তাঁর পিতা জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের সম্ভ্রান্ত ভূ-স্বামী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের এবং তিন কন্যা করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হুমায়রা। রোকেয়ার দুই ভাই কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁরা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাঁদের চিন্তা-চেতনায় আধুনিক সভ্যতার প্রচুর প্রভাব পড়ে। জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সাবেরের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে করিমুন্নেসা ও রোকেয়া ইংরেজি শিক্ষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আনুমানিক ১৩ বৎসর বয়সে বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি ছিলেন পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

যুগসন্ধির এক কঠিন সময়ে আত্মপরিচয় উদ্ধারের মহান ব্রত মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া। তাঁর লেখার মুখ্য বিষয় তাই স্বরূপের অন্বেষা, আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন রোকেয়ার জন্ম সেই সময়টা ছিল ভারতীয় মুসলিম সমাজের জন্য এক চরম সংকটময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়। ইংরেজ সরকার কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (১৭৯৩), লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ আইন (১৮২৮) এবং অন্যান্য পদক্ষেপ মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ছিল মারাত্মক আঘাতস্বরূপ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা। কারণ এটা ছিল লাখেরাজ সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মুসলমান সমাজ ধর্মের নামে নানাবিধ অধর্ম ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলামের মূল আদর্শ তথা সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের নীতি থেকে ভারতীয় মুসলিম, বিশেষত বাঙালি মুসলিম সমাজ তখন অনেক দূরে সরে যায়। সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র, পীরতন্ত্র, গোত্রবাদ, কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদি গোটা জাতির উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পশ্চাদমুখিতা

২. মুহম্মদ শামসুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্য কর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮০, পৃ. ১৪

সবদিক দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে গ্রাস করেছিল। মুসলিম সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথার কঠোরতার কথা সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য রোকেয়ার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি যথেষ্ট সহায়ক হবে :

> শিয়ালদহ স্টেশনে প্লাটফরমে ভরা সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোক ট্রেনের অপেক্ষায় পায়চারি করিতেছিলেন। কিছু দূরে আর একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে একগাদা বিছানা ইত্যাদি ছিল। পূর্বোক্ত ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করায় উক্ত গাদার উপর বসিতে গেলেন, তিনি বসিবা মাত্র বিছানা নড়িয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন। এমন সময় সেই দণ্ডায়মান ভদ্রলোক দৌড়াইয়া আসিয়া সক্রোধে বলিলেন, 'মশায় করেন কি? আপনি স্ত্রীলোকদের মাথার উপর বসিতে গেলেন কেন?' বেচারা হতভম্ব হইয়া বলিলেন, 'মাপ করবেন মশায়! সন্ধ্যায় আঁধারে ভালমত দেখিতে পারি নাই, তাই বিছানার গাদা মনে করিয়া বসিতেছিলাম। বিছানা নড়িয়া উঠায় আমি ভয় পাইয়াছিলাম যে, একি ব্যাপার।[৩]

এ' ঘটনার দ্বারা বোঝা যায় পর্দার দোহাই দিয়ে কিভাবে মেয়েদেরকে সবদিক দিয়ে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল।

জাতির এরূপ ক্রান্তিলগ্নে অন্ধকারে আলোর দিশারি হিসেবে আবির্ভূত হলেন মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া। একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসংস্কারক, নারী জাগরণের অগ্রদূত ইত্যাদি বহুবিধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তিনি। তাঁর ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি ; চিন্তাশক্তি ছিল পরিপক্ক ও দূরদর্শিতাপূর্ণ ; লেখনী ছিল যুক্তিপূর্ণ ও সাহিত্যরসে ভরপুর। তাই আমরা দেখব লেখনী থেকে শুরু করে অন্যান্য ব্যক্তিগত বা সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি অগ্রগামী। তৎকালীন সমাজ যা কল্পনাতেও ভাবেনি , তিনি তা সুবিন্যস্তভাবে লেখনীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করেও দেখিয়েছেন।

বস্তুত শিক্ষা মানুষের উন্নতির অন্যতম সোপান। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে। এর মাধ্যমেই মানুষের সৃজনশীলতা ও চিন্তাশক্তি বিকশিত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি শাণিত হয়। অথচ বাংলার মুসলিম নারীদেরকে শিক্ষার বিমল জ্যোতি থেকে বঞ্চিত রাখা

৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ৪৮৮

হয়েছিল যা রোকেয়াকে করেছিল দারুণভাবে ব্যথিত ও বিচলিত। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এক মাত্র শিক্ষার আলোই পারে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজমান কু-প্রথা, কুসংস্কারের পুঞ্জিভূত আবর্জনা সমূলে উৎপাটন করতে। এর জন্য আর হৈ চৈ করার দরকার পড়বেন না। অত্যন্ত বিচক্ষণ, আত্মপ্রত্যয়শীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রোকেয়া মনে প্রাণে অনুধাবন করেছিলেন যে, শিক্ষার বিমল জ্যোতির প্রভাবে নারীমনে সচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে এবং সমাজে নারী তার নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবে। তাঁর মতে, অনেকে মনে করেন, নারীদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নেই, তারা শুধু অন্তঃপুরে থেকে রান্নাবান্না, সেলাইকর্ম ও দুইচারটা উপন্যাস পাঠ করতে পারলেই যথেষ্ট, কিন্তু ডাক্তাররা বলেন যেহেতু মাতার দোষগুণ নিয়ে সন্তান জন্ম নেয়, কাজেই মাতা সুশিক্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। দৃঢ়চিত্তে রোকেয়া বলেন,

> মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা ভবিষ্যত জীবনে আদর্শ গৃহিনী, আদর্শ জ্ঞানী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিগণিত হইতে পারে।[৪]

নারী শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। এটিই কলিকাতার বুকে স্থাপিত প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়। শিক্ষাব্রতী রোকেয়া একবার তাঁর স্কুলের ছাত্রীদেরকে শিক্ষার সুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি সুন্দর গল্প বলেছিলেন,

> তোমরা জান যে, শয়তান মানুষের চিরশত্রু। শয়তানের অসংখ্য চেলা সমস্ত দিন মানবের দ্বারা যে সব পাপ করায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় শয়তানের নিকট আসিয়া তাঁহার রিপোর্ট দিয়া থাকে। একদিন কতকগুলি চেলা আসিয়া নানাবিধ পাপের রিপোর্ট দিল। শয়তান নীরবে শুনিতেছিল। শেষে যখন এক চেলা বলিল যে সে এক ছাত্রের পড়া ভুলাইয়া দিয়াছে, তাহাকে শয়তান কোলে লইয়া আদর করিল। তাহা দেখিয়া অপর চেলারা হিংসা করিয়া বলিল, আমরা এক কঠিন কঠিন পাপ নরহত্যা পর্যন্ত করাইলাম - তবু আমাদের অত আদর হইলনা, ও সামান্য একটা ছেলের পড়া ভুলাইয়া দিয়াছে, সেইজন্য ওকে কোলে লইয়া চুমা দেওয়া হইল। ইহা কি অবিচার। তদুত্তরে শয়তান বলিল, তোমরা বুঝনা, তাই এরূপ বল। মূর্খতা

---

৪. ঐ, পৃ. ৬৭

> হইল সমস্ত পাপের মা বাপ, মানুষ যতই মূর্খ থাকে ততই তার সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিজ্ঞলোকের বিরুদ্ধে আমাদের কোন প্রকার শয়তানী খাটেনা। অতএব, তোমরা সকলে প্রাণপণে চেষ্টা কর মানুষকে মূর্খ রাখিতে।[৫]

প্রকৃতপক্ষে বেগম রোকেয়া অপরিসীম মানসিক শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও রচনাবলি দ্বারা সকল বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আজীবন বঞ্চিত, নিপীড়িত নারী জাতির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। একজন মহিলার পক্ষে কলকাতার মত এত বড় শহরে স্বামী প্রদত্ত দশ হাজার টাকা দিয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা কত বড় সাহসের কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রবল সামাজিক বিরোধিতা, সরকারি অনুদানের অভাব ইত্যাদি বহুবিধ প্রতিকূলতার মুখেও এই মহিয়সী ক্ষণজন্মা দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গেছেন শুধুমাত্র স্কুলের উন্নতির জন্য।

কথায় বলে 'Morning shows the day'. আসলে রোকেয়া ছিলেন ছোটবেলা থেকেই শিক্ষানুরাগী। বাড়ির পরিবেশে মেয়েদের কঠোর পর্দা প্রথা চালু থাকায় মেয়েরা যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারত না। রোকেয়া তাই স্বীয় প্রচেষ্টায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেন। রোকেয়ার প্রতিভার বিকাশে বড় ভাই আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের, বড় বোন করিমুন্নেসা ও স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের অবদান ছিল অনবদ্য। দিনের বেলা পিতার চোখ ফাঁকি দিয়ে লেখাপড়া সম্ভব নয় বলে দুই ভাই বোন অধীর ভাবে অপেক্ষায় থাকতেন কখন রাত আসবে। রাতের অন্ধকারে দুই ভাই বোন বসেন পুঁথিপত্র নিয়ে। ভাই জ্ঞান দান করেন আর বোন সেই জ্ঞান অর্জন করেন। রোকেয়ার লেখনী সত্তা আত্মপ্রকাশ করে বিয়ের পর স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের সার্বিক আনুকূল্যে। 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নিরীহ বাঙালী' প্রবন্ধটি তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা। বিয়ের মাত্র ১১ বছর পর ১৯০৯ সালে তাঁর সুযোগ্য স্বামী ইন্তেকাল করেন। এতে আত্মপ্রত্যয়ী ও শিক্ষাব্রতী রোকেয়া ভেঙ্গে না পড়ে শক্ত হাতে হাল ধরেন ও স্বামীর সঞ্চিত টাকার মধ্যে দশ হাজার টাকা নিয়ে ভাগলপুরে মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

---

৫. ঐ. পৃ. ৬৬-৬৭

অনেকে বলেন রোকেয়া অত্যন্ত তীব্র নারীবাদী ব্যক্তিত্ব ছিলেন বিধায় নারীশিক্ষার পক্ষে এত জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। প্রকৃত সত্য হল তাঁর সমস্ত চিন্তাচেতনা, কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি ছিল মুক্তচিন্তা। অর্থাৎ যুক্তির কষ্টিপাথরে বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর লেখা, বক্তৃতা পরিচালনা করেছেন। কোন প্রকার ধর্মীয় অনুশাসন বা আপ্তবাক্যের স্মরণাপন্ন না হয়ে বরং বিচার-বুদ্ধি (reason) কেই ভালমন্দ নির্ধারণের মাপকাঠি মনে করেছিলেন। যুগ-সংস্কারক রোকেয়া নিবিষ্ট মনে, যুক্তির মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করে উদ্ভাবন করলেন যে, যে সমাজের অর্ধাংশ নারীসমাজ তারাই আজ সামাজিক ভাবে নানাদিক দিয়ে দারুণভাবে বঞ্চিত, উপেক্ষিত। সুতরাং সমাজের এই অর্ধাংশকে বাদ দিয়ে অপর অর্ধাংশ কিভাবে পুরো সমাজকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারবে? তিনি বলেন,

> .... আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে-একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।[৬]

স্বশিক্ষিত কিন্তু যথার্থ অর্থে সুশিক্ষিত এই মহিয়সী নারীর সাহিত্যেও - যেখানে বাস্তব রাজ্যকে কল্পনা রাজ্যে পরিণত করার প্রবণতা এবং অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ; বক্তব্যের মধ্যে কোন প্রকার অযৌক্তিকতার স্থান নেই ; মুক্তবুদ্ধি আপন গরিমায়, আপন সততার আলোতে মোহ আর অজ্ঞানতার তমসা কাটিয়ে তার চারপাশকে আলোকিত করে তোলে।[৭]

নারীমুক্তির সপক্ষে তাঁর নানাবিধ যুক্তির অবতারণাই তাঁর মুক্তবুদ্ধির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। এই সকল যুক্তির উপস্থাপনা করে তিনি নারী সমাজকে এবং সমগ্র বাঙালি সমাজকে বুদ্ধিমুক্তির অভিযানে যাত্রা শুরু করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যের সার কথাই হল : বুদ্ধিকে মুক্ত করতে অক্ষম হলে সত্যিকারের মুক্তি আনয়ন একেবারেই অসম্ভব।[৮]

---

৬ 'অর্ধাঙ্গী', ঐ, পৃ. ৩১

৭ ড. হাসনা বেগম, 'মুক্তবুদ্ধি, বেগম রোকেয়া ও নারী অধিকার', *সাহিত্য পত্রিকা*, ১৩৮৯, পৃ. ১১৫

৮. ঐ, পৃ, ১১৪-১৫

আসলে নারীশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে রোকেয়া নারী-পুরুষ সম্পর্কের পুনর্গঠন করতে চেয়েছেন। তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁকে মূল্যায়ন করা দরকার। যেহেতু অবরোধ প্রথার কারণে সে সময়ে মেয়েরা চার দেয়ালের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে কোন প্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারত না, তাই এতে সামাজিক উন্নতির দ্বারও রুদ্ধ হচ্ছিল। এ পরিস্থিতিতে রোকেয়া পর্দা রক্ষা করে মেয়েদেরকে শিক্ষার্জনে আগ্রহী করে গড়ে তোলার জন্যই তাঁর কর্মপরিধি ব্যাপ্ত করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি পুরুষদেরকে অবজ্ঞা করে মেয়েদের অধিকারকেই শুধু বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন - ব্যাপারটা তা নয়।

এখানে আরেকটা কথা বলে রাখা ভাল যে, রোকেয়া অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছেন, তিনি কিন্তু ইসলামি শরিয়ত প্রদত্ত পর্দা প্রথাকে যথেষ্ট সম্মান করেছেন। তাঁর লেখা থেকেই এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় ।

> আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব, প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই।[৯]

সত্যিই বেগম রোকেয়ার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন অধ্যয়ন করে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত না করে পারিনা। তাঁর অসাধারণ ত্যাগ-তিতিক্ষা, অধ্যবসায়, সহনশীলতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ইত্যাদির কারণে তিনি শুধু উপমহাদেশে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের কয়েকজন সেরা সংস্কারকের একজন বললে বোধ হয় ভুল হবে না। স্কুলের প্রতি যে তাঁর কি আত্মত্যাগ ছিল তা বোঝা যায় রোকেয়ার নিম্নোক্ত সাক্ষাৎকার থেকে,

> .... আমি যে অনিচ্ছাকৃতভাবে মানে অবরোধবাসিনী হয়েছি তার কারণ অনেক। আমার স্কুলটা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি সমাজের অযৌক্তিক নিয়মকানুনগুলিও পালন করছি। অবস্থা এরূপ এখন যে আমি পর্দার আড়ালে থেকে আপনার সাথে কথা বলছি, এটাও হয়ত দোষণীয় হয়ে পড়বে। আমি বাড়িতে বাড়িতে ক্যানভাস করে স্কুলের জন্য মেয়ে আনতে যাই। কিন্তু অভিভাবকরা আমাকে আগেই জিজ্ঞাসা করেন, পর্দা পালন করা হয় কিনা? এতটুকু ছোট্ট মেয়ের বেলায়ও এই প্রশ্ন! এখন বুঝুন কিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আমি স্কুল চালাচ্ছি

---

৯. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ.৭৯

> আর আমার অবস্থাটাই বা কিরূপ? স্কুলের জন্য আমি সমাজের সব অবিচার অত্যাচার সহ্য করে চলেছি।[১০]

ধর্ম যে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধক নয় বিচক্ষণ ও মেধাবী রোকেয়া এটা মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন। 'God gives man robs' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন ইসলাম ধর্ম নারী-পুরুষ উভয়ের উপর জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। তাঁর মন্তব্য হল,

> Our great prophet had said, 'Taibul Ilm ala kulli Muslimeen' (i.e. it is bounden duty of all Muslim males and females to acquire knowledge). But our brothers will not give us our proper share in education.[১১]

তাছাড়া রোকেয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছিলেন, সাথে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও এতে ছিল। কোরআন শিক্ষা বলতে তিনি শুধু টিয়া পাখির মত আরবি-শব্দ আবৃত্তি বুঝাননি। কোরআনের অর্থ অনুধাবন করা বুঝিয়েছেন। এ জন্য তিনি সরকারকে বাধ্যতামূলক আইন পাশের পরামর্শ দেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল তা না হলে মেয়েরা কোরআন শিক্ষার আলো থেকেও বঞ্চিত হবে।

রোকেয়া বুঝেছিলেন যে শিক্ষা মানবতাকে স্থুল চাহিদা থেকে মুক্ত করে এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করে, জ্ঞানের আলোকে হৃদয়কে বিভাসিত করে এবং জ্ঞান থেকেই তো মূল্যবোধের উন্মেষ। নারী শিক্ষা লাভ করে সর্বগুণে গুণান্বিতা হবে এই ছিল তাঁর কাম্য। তাই তাঁর লেখায় ঘরকন্যা, শিশুপালন, সেবা, সামাজিক দায়িত্ব প্রভৃতি সব দিকই আলোচিত হয়েছে।

'সুগৃহিনী' নামক প্রবন্ধে রোকেয়া দেখিয়েছেন শুধু রন্ধনপ্রণালী জানাটা গৃহিনী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তাদেরকে পরিমিত ব্যয় করার গুণটাও রপ্ত করতে হবে। কারণ পুরুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কত শ্রমের বিনিময়ে টাকা উপার্জন করে, অনেক গৃহিণী এটা চিন্তা করেও দেখেনা। তিনি মনে করেন প্রত্যেকটা নারীর জন্য সন্তান পালন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কাজেই প্রত্যেক মাকে জানতে হবে কিভাবে সুন্দরভাবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশুপালন করা যায়। তাঁর মতে, প্রত্যেকটি মেয়েরই মা হবার পূর্বে সন্তান

---

১০. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, 'বেগম রোকেয়া', *সওগাত*, অগ্রহায়ণ, ১৩৮২, পৃ. ১১৭
১১. 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির ভাষণ', *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ২৭৯

পালন শিক্ষা করা দরকার। তাঁর মতে, সুমাতার পুত্র সুপুত্র হয় এবং কুমাতার পুত্র কুপুত্র হয়। সেজন্য প্রত্যেক মাতারই উচিত সন্তানকে ছেলেবেলা থেকেই সর্ববিধ সদগুণ শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা। রোকেয়া মনে করতেন নারীরাই রোগী সেবার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু যথারীতি শুশ্রূষাপ্রণালী না জানলে এ ব্যাপারে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। গৃহিণীর অসতর্কতাবশত ওষুধপত্র ছোট ছেলেমেয়েদের নাগালের মধ্যে থাকার কারণে যে কোন ধরণের বড় বিপদ আপদ ঘটতে পারে বলে রোকেয়া মনে করেন। অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রোকেয়া নারীশিক্ষা সংক্রান্ত প্রত্যেকটা বিষয় এত তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এতে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। যেমন : এক জায়গায় তিনি বলেন,

> বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রক্ষা করা অতি আবশ্যক। এই গুণটা আমাদের অনেকেরই নাই। আমরা কেবল হায়! হায়! করিয়া কাঁদিতে জানি, বোধ হয় আশা থাকে যে, অবলার চক্ষের জল দেখিয়া শমনদেব সদয় হইবে! অনেক সময় দেখা যায়, রোগী এদিকে পিপাসায় ছটফট করিতেছেন, সেবিকা ওদিকে বিলাপ করিয়া (নানা ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া) কাঁদিতেছেন! হায় সেবিকা, এ সময় রোগীর মুখে কি একটু দুধ দেওয়ার দরকার ছিল না? এ সময়টুকু যে দুধ না খাওয়াইয়া রোদনে অপব্যয়িত হইল, ইহার ফলে রোগীর অবস্থা বেশী মন্দ হইল।[১২]

রোকেয়া তাঁর লেখনীর মাধ্যমে নারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও গঠনমূলক কাজেও উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি নারীদেরকে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন, অহেতুক ঝগড়া-বিবাদ, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকার ব্যাপারেও তাগিদ করেছেন। পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য অন্যের বিপদে সাহায্য দান, অভাবগ্রস্তকে অর্থ দান, দাসদের প্রতি ভাল ব্যবহার, সুপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন এমনকি কবিতা রচনায় ও মেয়েদেরকে উৎসাহিত করেছেন। জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠের প্রতি তিনি নারীদেরকে যে কতভাবে তাগিদ করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে তাঁর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে :

> এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই, ... তাহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড়-স্বর্ণ-মুক্তার অলংকারে সজ্জিত করেন, এই টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান-ভুষণে অলংকৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা

---

১২ ঐ, পৃ. ৪২

জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনিবর্চনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলংকার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব, শরীর শোভন অলংকার ছাড়িয়া জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ অমূল্য অলংকার।

'চোরে নাহি নিতে পারে করিয়া হরণ,
জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বন্টন
দান কৈলে ক্ষয় নাহি হয় কদাচন,
এ কারণে বলে লোকে বিদ্যা মহাধন।'

....

তাই বলি অলংকারের টাকা দ্বারা 'জেনানা স্কুলের' আয়োজন করা হউক। কিন্তু ভগ্নীগণ, যে স্কুল লাভের জন্য সহজে গহনা ত্যাগ করিবেন, এরূপ ভরসা হয়না। দুঃখের কথা কি বলি, ... আমার ভগ্নীদিগকে বোধ হয় এক প্রকার গৃহসামগ্রীর মধ্যে গণনা করা হয়। তাই টিবেলটা যেমন : ফুল-পাতা দিয়া সাজান হয়, জানালার পর্দাটা যেমন ফুলের মালা, পুঁতির মালা বা তদ্রূপ অন্য কিছু দ্বারা সাজানো হয়, সেইরূপ গৃহিণী-আপন পুত্রবধূটিকেও একরাশি অলংকার দ্বারা সাজান আবশ্যক বোধ করিয়া থাকেন! সময় সময় ভ্রাতাগণ আমাদিগকে 'সোনা-রূপা রাখিবার স্তম্ভ (stand) বিশেষ বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েনা। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।[১৩]

রোকেয়ার সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত কিছু অনালোচিত দিক

আমরা জানি, একজন দক্ষ সমাজ সংস্কারক হিসেবে রোকেয়া বারংবার সমাজের বিভিন্ন অসংগতিসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং এসব ক্ষেত্রে প্রতিকার ও সংশোধনের উপায়ও নির্দেশ করেছেন।

সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ

রোকেয়া মনে করতেন শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত উৎকর্ষকেই সভ্যতার মানদণ্ড ধরা ঠিক নয়। তাঁর মতে শুধু কিছু ধনী ব্যক্তির ভাগ্যোন্নয়নই উন্নতির চাবিকাঠি নয়। প্রকৃতপক্ষে গরিব চাষারাই সমাজের মেরুদণ্ড। তাদের দুঃখ যাতে দূর

১৩. ঐ. পৃ. ৫২

হয় সেজন্য তিনি সরকারকে সবিশেষ চেষ্টা করার পরামর্শ দেন। 'চাষার দুক্ষু' নামক প্রবন্ধে রোকেয়া সমাজে বিদ্যমান দারিদ্র্যের কারণ উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হন। তিনি মনে করেন বিলাসিতা এর অন্যতম প্রধান কারণ। অর্থাৎ যেহেতু আজ সুলভে রঙিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়। সেহেতু চরকা নিয়ে ঘরঘর করার লোকের দরকার পড়েনা। বাংলার অর্থনৈতিক দুর্দশার আরেকটি কারণ অনুকরণপ্রবণতা বলে রোকেয়া মনে করেন। একটু সচ্ছলতা আসলেই ভারতবাসী বড়লোকদের অনুকরণ করে যা মোটেই আশাপ্রদ নয় বলে তিনি মনে করেন। সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে দেশী শিল্পসমূহের ক্রমশ বিলুপ্তিও দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য মঙ্গলজনক নয় বলে দক্ষ সমাজ সংস্কারক রোকেয়া বিশ্বাস করতেন। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়,

> আবার সেই মরাই-ভরা ধান, ঢাকাই মসলিন ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশী শিল্প বিশেষতঃ নারী শিল্প সমূহের পুনরুদ্ধার।[১৪]

রোকেয়া পাট চাষের উপর জোর না দিয়ে তার পরিবর্তে কার্পাস চাষে বেশি মনোনিবেশ করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন। এ ছাড়া তিনি চরকা ও এণ্ডি সূতার প্রচলন বহুল পরিমাণ করার আহবান জানান। ক্লেশ লাঘবে এণ্ডি পোকা প্রতিপালন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকোর প্রচলন শুরু হলে চাষা তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে।

রোকেয়া রচিত 'এণ্ডি শিল্প' প্রবন্ধটি অধিকতর তথ্যপূর্ণ, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বাস্তবতা নির্ভর। রংপুরের এই বিলুপ্ত প্রায় শিল্পটি এক সময় সমগ্র বাংলাদেশের গৌরব বলে চিহ্নিত হত। এণ্ডির ঐতিহাসিক পরিচয় সূত্রে রোকেয়া গুটিপোকা পালন, গুটি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সবশেষে চরকায় সূতা তৈরির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এভাবে একান্ত পারিবারিক পর্যায়ে একটা ছয় হাত লম্বা ও তিন হাত চওড়া রেশমি চাদরের (১৯২১ সালের হিসাব মতে) বিক্রয় মূল্য ১২ টাকা হতো। লেখিকার প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী মাত্র ৮ টাকা ব্যয়ে এ রকম একটা চাদর তৈরি হত। সুতরাং সামান্য মূলধন ও শ্রমেই ঘরে বসে ৪ টাকা লাভ তখনকার দিনের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল।

---

১৪ . ঐ, পৃ. ২৬৬

অতিশয় সমাজ সচেতন ও দেশের অর্থনৈতিক বিপন্নতায় ক্ষুব্ধ রোকেয়া আমাদের দেশের কৃষি ও শিল্পের এই দুঃখজনক বিপর্যয়ের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, এর প্রতিবিধানেরও পরামর্শ দিয়েছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তিনি এগুি শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর সুদূর প্রসারী সুফলের কথা ব্যক্ত করেছেন। নারীর স্বভাবসুলভ মানসিকতা যেমন গৃহরক্ষা, সন্তান পালন, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদির কথা অন্তরে লালন করেও যে নারী দৃপ্ত অঙ্গিকার ও সাহসিকতার সাথে উচ্চারণ করেন 'চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড' 'গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র ঘুচিবে', তাঁর প্রাগ্রসর বাস্তবতায় আমরা চমকিত ও মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

তালাক

সেই অন্ধকার যুগে অন্যান্য বিষবৃক্ষের মত তালাক প্রদানের ক্ষেত্রেও মেয়েদের কোন রকম অধিকার ছিল না। অথচ মুসলিম আইনে বিয়েতে ছেলে-মেয়ে উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন। তাই কোন কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে সেখানেও উভয়ের সম্মতি দরকার। অথচ এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিচ্ছেদে মেয়েদের মতের তোয়াক্কা করা হতনা। রোকেয়া সমাজের এই অন্যায় প্রথাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেছেন ও এর সংস্কার চেয়েছেন। তাঁর 'নারীর অধিকার' শীর্ষক লেখা পড়লে এ ধারনা আরও স্পষ্ট হয়। অতিশয় মেধাবী ও অধ্যবসায়ী রোকেয়া মৃত্যুর পূর্বরাতে এ অসমাপ্ত লেখাটি লিখে পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। পরে তাঁর চাচাতো বোন বেগম মরিয়ম রশিদ লেখাটি রোকেয়ার মৃত্যুর পর তাঁর টেবিল থেকে পরম যত্ন ও সতর্কতার সাথে রক্ষা করেছিলেন। সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ মেয়েদের তালাক সংক্রান্ত লেখাটি নিম্নরূপ :

> আমাদের উত্তরবঙ্গে দেখেছি গৃহস্থ শ্রেণীর মধ্যে সর্বদা তালাক হয় অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে। মেয়েটির কোন ত্রুটি হলেই স্বামী দম্ভভরে প্রচার করে। আমি ওকে তালাক দেব। আজই দেব। তারপর ঘরের ভিতর বসে কতকগুলি স্ত্রীলোক ঐ ভাগ্যহীন মেয়েটিকে নিয়ে ; সামনে বারান্দায় কিংবা উঠানে বসে স্বামী নামক জীবটাকে নিয়ে কতকগুলি পুরুষ ; এইসব লোকগুলির সামনে স্বামী লোকটি তিনবার উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে :

আয়ন তালাক, বায়েন তালাক,
তালাক তালাক, তিন তালাক
আজ জরুরে দিলাম তালাক।

এই সময় পুরুষটিকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। বোধ হয় নূতন পত্নী লাভ হবে এই আনন্দে। কিন্তু মেয়েটি ভয়ানক কাঁদে। এরপর কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক মেয়েটিকে ধরে তার কানের, নাকের হাতের অলংকারগুলি খুলে শাড়ীর আঁচলে বেঁধে দেয়। হাতের কাঁচের চুড়িগুলি এক টুকরা ইট বা কাঠের সাহায্যে ভেঙ্গে দেয় আর বলে দেন মোহর মাফ করে দিয়ে যা। মেয়েটি এই সময় ভয়ানক কাঁদে। বেচারী স্বামী হারিয়ে সাজ-সজ্জা হারিয়ে হাতে গড়া সাধের পাতানো সংসার হারিয়ে রিক্ততার দুঃখ নিয়েই কাঁদে।

এর পরের দৃশ্য পুরুষটি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে কোথাও বেড়াতে যায়। আর মেয়েটির বাপ, ভাই, চাচা বা মামু যে অভিভাবক রূপে উপস্থিত থাকে (কারণ এইরূপ দু একজনকে পূর্বেই ডেকে আনা হয়) সেই অভিভাবক স্থানীয় লোকটি তখন ঐ ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে টেনে হিঁচড়ে পাল্কী কিংবা গরুর গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

বৃদ্ধ পুরুষদের বালিকা বিবাহে কত আগ্রহ ও সাধ সেই সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গে এই একটি ছড়াও প্রচলিত রয়েছে :

হুকুর হুকুর কাশে বুড়া
হুকুর হুকুর কাশে
নিকার নামে হাসে বুড়া
ফুকুর ফুকুর হাসে।[১৫]

অন্যত্র তিনি বলেন,

তালাক লইতে হইলে ডেলিশিয়াকে প্রমাণ করিতে হইবে স্বামী বিশ্বাসঘাতক এবং দুই বৎসরের অধিককাল তিনি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন। ডেলিশিয়া ইহা প্রমাণ করিতে পারিবেনা। হায়রে আইন! পুরুষ রচিত আইন পুরুষের সুবিধার নিমিত্ত ইহার সৃষ্টি। অবলা হৃদয় দলন করা, তাহার জীবন মাটি করা, তাহাকে জীবন্ত হত্যা করা আইন অনুসারে অত্যাচার নয়। কাহাকেও শারীরিক কষ্ট দিলে, জখম করিলে

১৫. ঐ. পৃ. ৩১৪-১৫

অপরাধীর শাস্তি আছে কিন্তু রমণীহৃদয় বিদীর্ণ করিলে, শতধা করিলে, রমণী জীবন্ত সমাধি করিলে কোন দণ্ড নাই।[১৬]

'পদ্মরাগ' উপন্যাসে রোকেয়া তালাক নিয়ে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন। সেখানে তাঁর উক্তি,

অকারণ তালাকের বিরুদ্ধে কোন আইন নাই কি?[১৭]

বিধবাবিবাহ ও বাল্যবিবাহ

সামাজিক কু-প্রথার সংস্কার ও মঙ্গল অনিবার্য হলেও যে সহজসাধ্য নয়, এ কথা রোকেয়া জানতেন। তবু নিরলস মহান আত্মত্যাগী রোকেয়া আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন একটি সুন্দর, উন্নত ও ভারসাম্যময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়ে। তিনি তাঁর রচনায় বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের চেয়ে মুসলিম আইন যে কত উদার তা দেখিয়েছেন। সাথে তিনি মুসলমানদেরকে দোষারোপ করেছেন এই বলে যে, হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় আইনের সংস্কার সাধন করতে সচেষ্ট। অথচ মুসলমানরা মুসলিম মেয়েদের বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে এত সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও তা লুফে না নিয়ে বরং গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলেছে। হিন্দু আইনের চেয়ে মুসলিম আইনের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি এভাবে তুলে ধরেন যে, হিন্দু স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সাথে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা আছে। তারা এখন সমঝতা না হলেও জীবন্মৃতা বলা যায় কারণ বিধবার শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ হতে বিরত থাকলেই চলবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে সর্বপ্রকার সুখাদ্য ত্যাগ করে শুধুমাত্র ফলমূল খেয়ে জীবনপাত করতে হবে। পক্ষান্তরে, ইসলাম বিধবা নারীকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। বিধবার প্রতি কোন রকম অত্যাচার করা হয়না, তার খাদ্য সামগ্রীর ব্যাপারে কোন রকম বিধিনিষেধ নেই।

তা ছাড়া হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রতি গৃহপালিত পশু বা দাসীর ন্যায় ব্যবহার করতে পারে। আট বছর বয়সে কন্যা বিয়ে দিলে তারা গৌরী দানের ফল প্রাপ্ত হন। অথচ ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে সম্মতি প্রদানে বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েরা স্বাধীন। এতে পরোক্ষভাবে বাল্য-বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

---

১৬. ঐ, পৃ. ১৩৪-৩৫
১৭. ঐ. পৃ. ৩৯১

'বলিগর্ত' নামক রম্যরচনায় বেগম রোকেয়া পরোক্ষভাবে বহুবিবাহের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন এভাবে :

> মি. খটখটে পুরুষের জন্য চারি বিবাহ করা অতি প্রয়োজনীয় সুন্নত মনে করেন। আর হিন্দুয়ানি সকল প্রথাকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু নিজের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বিধবা ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাবে এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, আমরা যখন হিন্দু দেশে আছি তখন তাহাদের আচার নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য। কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিধবার বিবাহ হয়না।[১৮]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সামাজিক অনাচার ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে রোকেয়া যেন এক নিয়ম প্রতিবাদী কণ্ঠ। সমাজ ও জাতিকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামির তমসাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন যে সকল মহামানব, তাদের প্রত্যেকেই নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের কারো চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। রোকেয়াও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর নিজের কথায়ই এর প্রমাণ পাওয়া যায় :

> আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর, সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সমাজ সেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাৎ কুড়াইয়াছি।[১৯]

যৌতুক প্রথা

যৌতুক প্রথা এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি। এ প্রথায় বিয়ের সময় কন্যা পক্ষের তরফ থেকে বরকে নগদ টাকা পয়সা বা দ্রব্যসামগ্রী দেয়া হয়। অনেক সময় কন্যার যোগ্যতার পরিবর্তে এই টাকা বা সামগ্রীর মূল্যমানের উপরই নির্ভর করে প্রস্তাবিত বিয়েতে বরপক্ষের সম্মতি বা অসম্মতি। সেই অন্ধকার যুগে রোকেয়া উপলব্ধি করলেন যে, সমাজের প্রতিটি পরতে ছড়িয়ে আছে যৌতুক প্রথার ন্যায় এক অযাচিত প্রথা। অথচ তিনি জানতেন যে ইসলাম ধর্মের চিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম ধর্মানুসারে, বিয়েতে বরং বরের জন্যই কনেকে আর্থিক সংগতি অনুসারে কন্যা কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট অংকের

---

১৮ . ঐ, পৃ. ৫৪২.
১৯ . ঐ পৃ. ১৩৬-৩৭

মোহর প্রদান করে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অত্যাবশ্যক কর্তব্য। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় সমাজে যৌতুক প্রথা মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছিল যা রোকেয়াকে করেছিল দারুণভাবে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত এবং তিনি মনে প্রাণে এর উচ্ছেদ চেয়েছিলেন 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ,

> কন্যা পণ্য দ্রব্য নহে যে তাহার সঙ্গে মোটর গাড়ি ও তেতালা বাড়ি ফাউ দিতে হইবে।[২০]

স্বাধীনতাকামী রোকেয়া

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। একটি নির্বোধ শিশুও শৃঙ্খল ভেঙ্গে অবাধে বিচরণ করতে চায়, বোঝে স্বাধীনতার মর্মার্থ। সর্ববিধ চিন্তার অধিকারী রোকেয়াও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর লেখা পড়ে তাঁকে সরাসরি স্বাধীনতা পিপাসু বলতে কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হবেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলির অধ্যয়ন এটাই প্রমাণ করে যে, পরাধীনতার গ্লানি রোকেয়ার হৃদয়কেও ক্ষতবিক্ষত করেছে। তিনিও লেখনীর মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে মানুষকে এর শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমরা জানি রোকেয়ার জীবনকাল ব্রিটিশ শাসনাধীন পরাধীন ভারতে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন রোকেয়া সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার চেয়ে কেন বাঙালি পরাধীন এবং এই পরাধীনতা কেন শেকড় গেড়ে বসে আছে তার কারণ অনুসন্ধানে তৎপর ছিলেন, 'নিরীহ বাঙালী' প্রবন্ধে তিনি ব্যাঙ্গাত্মকভাবে বাঙালি চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে :

> আমরা আরও অনেক সহজ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকি। যথা -
>
> (১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা 'রাজা' উপাধি লাভ সহজ।
>
> (২) শিল্পকার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B.Sc. ও D. Sc. পাশ করা সহজ।
>
> (৩) অল্পবিস্তর অর্থ ব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা 'খাঁ বাহাদুর' বা 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভের জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।

---

২০. ঐ, পৃ. ৪৫৩

(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রের শোক দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীর বড় লোকদের মৃত্যু দুঃখে 'শোক সভার' সভ্য হওয়া সহজ।

(৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।[২১]

রোকেয়ার স্বাদেশিকতার মনোভাব প্রকাশ পায় তাঁর 'এণ্ডি শিল্প' প্রবন্ধে। পরাধীনতার কারণ অনুসন্ধানে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রূপকের আশ্রয় নিয়েছে 'জ্ঞানফল' রূপকথাতে। এতে কনকদ্বীপ ভারতবর্ষের রূপক, পরীস্থান বৃটেন আর জিন বণিকরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। নিম্নোক্ত উদ্বৃতি দ্বারা এ ধারণা স্পষ্ট হয় :

> .... জিনগণ মনস্থ করিল, তাহারা নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিবে। অতঃপর তাহারা মাকাল ফলে জাহাজ বোঝাই করিয়া বাণিজ্য ব্যপদেশে যাত্রা করিল। জিনদের জাহাজখানি নানা স্থান ঘুরিয়া বিরাট সাগরের উপকূলে কনকদ্বীপের এক বন্দরে উপনীত হইল। .... কনকদ্বীপের সমৃদ্ধিশালী নগর দেখিয়া জিন বণিকের চক্ষু স্থির হইল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, তাহাদের মত ঐশ্বর্যশালী দেশ আর নাই ; তাহারা 'ধুলামুঠা করিলে সোনামুঠা' হয়। কিন্তু কনকদ্বীপের ভূমি রত্নগড়া। .... পুর্বে দুই এক খানা জাহাজে বৎসরে একবার মাত্র মাকালের আমদানি হইত। পরে অসংখ্য তরীপূর্ণ মাকাল বৎসরে তিন চারিবার কনকদ্বীপে আসিতে লাগিল। আর রাশি রাশি ধান্য পরীস্থানে রপ্তানি হইতে চলিল। .... সুতরাং কনকদ্বীপে দুর্ভিক্ষ রাক্ষুসী আসিয়া ঘর বাঁধিল।[২২]

এ ছাড়া 'মুক্তিফল'-এ কাঙ্গালিনী চরিত্র ভারতবর্ষের রূপক। এখানে রোকেয়ার অভীষ্ঠ লক্ষ্য হল এটা দেখানো যে, স্বদেশের কিছু ব্যক্তি যেমন মীর জাফরের মত ব্যক্তিরা নিজেদের সুখ-সুবিধার জন্য দেশকে অবহেলা করে বিলিয়ে দিয়ে থাকে। তা ছাড়া দেশের স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথাও এ থেকে বোঝা যায়। এর মাধ্যমে আরও একটি বক্তব্য স্পষ্ট হয়, সেটা হল স্বাধীনতা আসে আলাপ-আলোচনা বা, আবেদন-নিবেদনে নয় বরং স্বাধীনতা আসে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

---

২১. ঐ. পৃ. ৩৪

২২. 'জ্ঞানফল' ঐ, পৃ. ১৮২-৮৪

মেয়েদের ভোটাধিকার

পুরুষদের ন্যায় ভোটাধিকার লাভের জন্য নানা পর্যায়ে আন্দোলন করে মার্কিন মহিলারা তাঁদের শাসনতন্ত্রের ঊনবিংশ সংশোধনীর মাধ্যমে ভোটাধিকার লাভ করেন ১৯২০ সালে। ইংল্যাণ্ডে নারী-পুরুষে সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ১৯২৮ সাল থেকে। অথচ মুসলিম আইনে নারীপুরুষ উভয়ের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন নারীরা ছিল দারুণভাবে উপেক্ষিত। এ বিষয়টি রোকেয়ার বিবেককে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি বলেন,

> এখন স্ত্রীলোকেরা ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছেন। গত ইলেক্‌শনের সময় দেখা গেল কলিকাতায় মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে। ইহা কি মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন্ সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।[২৩]

আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মে মানুষে মানুষে, ধনীগরিবে, ছোট-বড় বা সাদা-কালোতে কোন ভেদাভেদ নেই। যুগসংস্কারক রোকেয়াও এই সত্য মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন। 'পঁয়ত্রিশ মণ খানা' শীর্ষক রম্য রচনায় তিনি সমাজের আশরাফ-আতরাফ গত অমানবিক শ্রেণী বিভাগকে আক্রমণ করেছেন। রোকেয়া মাসিক 'সওগাতে' 'আশরাফ ও আতরাফ' শীর্ষক এক ছবির কথা বর্ণনা করেন যেখানে আশরাফ আতরাফকে ব্যঙ্গভরে বলছে, 'তুমি দূরে থাক, আমার নিকট আসিওনা।' আতরাফের প্রতি আশরাফের এরূপ আচরণ-সমাজহিতৈষী রোকেয়ার হৃদয়কে দারুণভাবে বিদীর্ণ করেছিল। তাঁর লেখনীতেই এটা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে, "এত বড় আস্পর্ধা! মানুষকে ঘৃণা! ইচ্ছা হইল তখনি আশরাফদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিয়া দেই।"[২৪]

---

২৩. ঐ, পৃ. ২৮০
২৪. ঐ, পৃ. ৫৪৪

দাস প্রথা

'বলিগর্ত' নামক প্রবন্ধে দাসপ্রথা সম্পর্কেও বেগম রোকেয়ার নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। তাঁর ভাষায়,

> জেহাদের পুণ্য অর্জ্জনের নিমিত্তে তাঁহারা বাড়ীর দাসী এবং প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করেন। পাঠিকা শুনিয়া আশ্চর্য হইতে পারেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আমলেও বহু দেশে 'দাসী' আছে? ঐ সব দাসী প্রকাশ্যে হাটেবাজারে ক্রীতা হয় নাই ; ইহারা দরিদ্র প্রজার ঘর হইতে ছলে বলে কৌশলে ধরিয়া আনা দাসী। এইরূপে বাড়ীর বিবিগণ বাঁদী মারিয়া এবং খাঁ বাহাদুর প্রজা ঠেঙ্গাইয়া জেহাদের পূণ্য অর্জন করিয়া থাকেন।[২৫]

পীরপূজা

তৎকালীন অধঃপতিত মুসলিম সমাজ ধর্মের মূল আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে নানা ধরনের গোঁড়ামিতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আসলে ব্যক্তিপূজা, বস্তুপূজা, আল্লাহর প্রতি বিভিন্ন রূপে অনাস্থাশীলতা প্রভৃতি শিরকেরই বিভিন্ন রূপ। বেগম রোকেয়া মনে প্রাণে চেয়েছিলেন এসব শিরকের বিভিন্ন উৎসকে সমূলে নির্বাপণ করতে। তিনি বলেন,

> যেহেতু দেবতাদের অনুকরণে অনেকগুলি পীরের নাম শুনা যায় - এক এক প্রকার বিপদে এক এক পীরের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত - 'নজর ও নেয়াজ' দিতে হয়! য়াহাকে ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন করে, সে বেচারা 'কোত্তা (কুকুর) পীরের দরগাহে' (মন্দিরে?) গিয়া 'নজর' (দর্শনী) মানত করিয়া আইসে! হঠাৎ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে 'আচানক (হঠাৎ) পীরের' উদ্দেশ্যে রোজা রাখা হয়!! সম্ভবত পা খোঁড়া হইলে 'লঙ্গর শাহের দরগাহে' 'শিন্নী' লইয়া যাইতে হয়!![২৬]

এ ছাড়া পঁয়ত্রিশ মণ খানা' নামক রম্যরচনাতেও তিনি পীর-মুর্শিদের তৎকালীন অবস্থার এক রূপক চিত্র অংকন করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থান থেকে সবচেয়ে মারাত্মক বিচ্যুতিকে চিত্রায়িত করেছেন। আসলে ধর্মের মধ্যে নানা রকম কুসংস্কার প্রবেশ করার ফলে এ উপমহাদেশে পীর-ব্যবসা বেশ রমরমা ব্যবসা হিসেবে জমে উঠেছে। যা

---

২৫. ঐ, পৃ. ৫৪০
২৬ 'রসনাপূজা' ঐ, পৃ. ২৫১

ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহিদ এর ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজসংস্কারক রোকেয়ার চোখেও ঐ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তিনি এর সংস্কারও চেয়েছেন।

সুদ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ

ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক সুদ গ্রহণ ও প্রদান দুটোই সমান পাপ। এ বিষয়েও রোকেয়ার সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নির্জলা সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত 'বলিগর্ত' নামক রচনায়। সেখানে তিনি বলিগর্তের জমিদার খাঁ বাহাদুর কশাই উদ্দিন খট্‌খটের দরিদ্র প্রজাদের নিকট হতে উচ্চ হারে সুদ গ্রহণকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন খটখটে সাহেব পরম ধার্মিক লোক, সব সময় কোরআন-হাদিস নিয়ে পড়ে থাকেন। তাঁর তিনজন স্ত্রী এবং দাস-দাসী প্রত্যেকেই অতি নিষ্ঠাবান মুসলমান। অথচ রোকেয়া বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে এ ধরনের ধার্মিক লোক নির্দ্বিধায় সুদ গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র প্রজাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্ছে।

বেগম রোকেয়ার চিন্তাভাবনা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকায় যে বিধি বিদ্যমান তার বিপরীতধর্মী চিত্রকে আমাদের সামনে উত্থাপন করেছেন। আসলে রোকেয়াকে কোন সীমিত পরিসরে পরিচিত করানো (যেমন : নারীমুক্তির অগ্রদূত) অর্থ তাঁর প্রতি অবিচার করা। শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি থেকে শুরু করে জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তার পদচারণা নেই। তিনি নারী জাতি তথা সমগ্র জাতির গর্ব, বিরাট সম্পদ। এখন প্রয়োজন তাঁর প্রতিভার সঠিক বিশ্লেষণ, উপযুক্ত মূল্যায়ন।

অনেকে রোকেয়ার মনমানসিকতা, চিন্তাভাবনার সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাকে নারীবাদী ও পুরুষ-বিদ্বেষী বলে অভিহিত করতে চান। এই মূল্যায়ন সঠিক কি-না তা দেখার আগে 'নারীবাদ' শব্দটির ব্যাখ্যা দরকার। আসলে পাশ্চাত্যে 'নারীবাদ' শব্দটি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে যার শুরু 'লিবারেল ফেমিনিজম' দিয়ে। লিবারেল ফেমিনিজমের উৎপত্তি ঊনবিংশ শতকে। এর প্রধান বক্তব্য হল নারীর পুরুষদের মত সব ক্ষেত্রে সমানাধিকার যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ভোটাধিকার, বাকস্বাধীনতা ইত্যাদি পাবার দাবিদার। অর্থাৎ সামাজিক যে কোন কর্মকাণ্ডে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও সমান

অংশগ্রহণ থাকতে হবে। তাদের কথাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। এরপর বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে আবির্ভাব হল 'র‍্যাডিকাল ফেমিনিজম'-এর। এ মতবাদানুসারে পুরুষ ও নারী পৃথক শ্রেণী এবং পুরুষদের সহযোগিতা ছাড়াও নারীরা স্বাবলম্বী। এ মতানুসারে পিতৃতন্ত্র কোন গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। এটিই নারীদের অধিকার হরণের হাতিয়ার। সত্তরের দশকে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'মার্ক্সবাদী ফেমিনিজম'-এর। এ মতবাদের পৃষ্ঠপোষকরা মনে করেন, গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে নারী শোষিত হয়, কারণ এটা একটা অনুৎপাদনশীল শ্রম। ঘরের কাজে মেয়েরা কোন পারিশ্রমিক পায়না। অর্থাৎ এ মতবাদ লিঙ্গভিত্তিক কর্মবিভাজনের প্রতিবাদ জানায়। আজকে বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে ফেমিনিজমের এই ধারণাই বিরাজমান।

এখন নারীবাদী চেতনার এ সব ধারা বিশ্লেষণের পর রোকেয়ার নারীবাদী চিন্তা মূল্যায়নের পালা। এ কথা ঠিক যে, রোকেয়ার কথাবার্তায়, সাহিত্যে, কর্মে সর্বব্যাপী অনুরণিত হয়েছে নারীমুক্তির কথা। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে নারীবাদী বলতে যা বোঝায় রোকেয়া তা ছিলেন না। নারী জাতির ধর্মপ্রদত্ত সম্মান, মর্যাদাবোধ ও আইনগত অধিকারের কথা উচ্চারণ করলেই যদি কেউ নারীবাদী হয়ে যান, তাহলে যে কোন মহিলা লেখিকাই নারীবাদী হতে বাধ্য। কারণ সব মহিলাই চাইবেন তার সমগোত্রীয়দের যথাযথ স্বার্থ সমুন্নত রাখতে ও এর পক্ষে লেখনী পরিচালনা করতে। কোন লেখক-লেখিকাকে মূল্যায়ন করার সময় আমাদের উচিত তাঁকে তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করা। কারণ প্রত্যেক দার্শনিক থেকে শুরু করে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মনীষার স্ফূরণের ওপর তাঁর শিক্ষা ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> Philosophers are both effects and causes : effects of their social circumstances and of the politics and institutions of their time, causes (if they are fortunate) of beliefs which mould the politics and institutions of later ages.[২৭]

আমরা ইতিমধ্যেই রোকেয়ার সমকালীন পরিবেশের একটা ভয়াবহ চিত্র অবলোকন করেছি। আমরা দেখেছি বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি এসে রোকেয়া

---

২৭. B. Russel, *History of Western Philosophy*, George Allen & Unwin Ltd., New edition, London, 1962, p. 7

উপলব্ধি করলেন যে, নারীদের যে একটা জীবন্ত সত্তা আছে সে ব্যাপারেই সে অঞ্চলের মেয়েরা সন্দিহান। সেই বীভৎস আঁধার যুগে কিভাবে নারীকে সর্বপ্রকার দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করা যায়- এটিই ছিল রোকেয়ার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যদি নারী হয়ে নারীদের দুর্বিষহ অবরোধের কবল থেকে মুক্ত করতে চান, তাদেরকে শিক্ষার আলো দেখাতে চান তাহলেই কি নারীবাদী হয়ে যান? না, খুব বেশি হলে আমরা তাকে 'লিবারেল ফেমিনিস্ট' বলে আখ্যাত করতে পারি।

নারীদেরকে এই ঘোর অমানিশা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি হয় পুরুষদেরকে একটু মৃদু ভাষায় তিরষ্কার করেছেন। তার মানে এই নয় যে, পুরুষজাতি তার কাছে ঘৃণার পাত্র ছিল। তা থাকলে তিনি তাঁর স্বামীর পূর্ণ স্মৃতিরক্ষণে কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করে স্বামীকে চিরস্মরণীয় করে রাখতেন না।

তা ছাড়া স্বামী নিন্দায় যে অনেক স্ত্রী সুখ অনুভব করেন, রোকেয়া সেসব অপরিণামদর্শী নারীদেরকেও ধিক্কার জানিয়েছেন। অশিক্ষিত ও সংকীর্ণ চিত্ত রমণী চিত্র অংকনে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী। 'পদ্মরাগ', 'অর্ধাঙ্গী', 'স্ত্রী জাতির অবনতি' ইত্যাদি রচনাই এর প্রমাণ।

পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে যে কজন মনীষী আপন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে স্বজাতির হৃদয়ে প্রোজ্জ্বল আসন দখল করে আছেন। রোকেয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। বন্ধ দুয়ার মুক্ত করে নারীর জন্য সহজ স্বাভাবিক জীবন স্পন্দনের ক্ষীণ হলেও যে ধারা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা আজো বহমান। আজ বাঙালি নারীর সম্মান-প্রতিষ্ঠা পরিবারে-সমাজে সর্বত্রই বেড়েছে (যদিও সার্বিকভাবে নারীরা আজও তাদের সঠিক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত)। বস্তুত বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যের কারণে মানুষ আজ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। আবার, একদিকে দরিদ্র দেশসমূহের অন্তর্জ্বালা, অন্যদিকে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার এ দুয়ের মাঝখানে সমকালীন পৃথিবীর মানুষ হারিয়ে বসেছে নীতিবোধ, ধর্মীয় বোধের প্রতি আস্থা। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে আমাদের এ উপমহাদেশেও সরবে উচ্চারিত হচ্ছে সনাতন মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নতুন মূল্যবোধের সংকটের কথা। এ পরিস্থিতিতে যথার্থ মানুষ হিসেবে টিকে থাকতে হলে, জাতি হিসেবে অগ্রগতি অর্জন করতে

হলে আমাদের অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে। সমন্বিত অর্থনৈতিক ও নৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এক কথায়, অন্ন-বস্ত্রের অনুসন্ধানের পাশাপাশি সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের আদর্শে উজ্জীবিত হতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ক্রান্তিলগ্নে এই প্রয়োজনের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বেগম রোকেয়া। রোকেয়ার বাণী থেকে সমকালীন মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করুক এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অশান্ত পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি ও অনাবিল সুখ প্রতিষ্ঠিত হোক, বেগম রোকেয়ার চিন্তা-চেতনার, দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক বিশ্লেষণ হোক, তিনি তাঁর সঠিক পরিচয়ে পরিচিত হোন, ভবিষ্যৎ রোকেয়া-গবেষকদের কাছে এই আমাদের প্রত্যাশা।